Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-IX, Issue-II, January 2021, Page No.10-16
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

শ্রেণি, জাতি, অস্পৃশ্যতা : স্বাধীনোত্তর ভারত

স্বপন শর্মা
গবেষক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা

Abstract:

The Indian Caste System is historically one of the main dimensions where people in India are socially differentiated through class, caste and untouchability. Although this or other forms of differentiation exist in all human societies, it becomes a problem when one or more of these dimensions overlap each other and become the sole basis of systematic ranking and unequal access to valued resources like wealth, income, power and prestige. The Indian Caste System is considered a closed system of stratification, which means that a person's social status is obligated to which caste they were born into. There are limits on interaction and behavior with people from another social status. It is interesting and informative to know about the origin of such social stratification that has affected the discourse of Indian society and politics in some manner. This paper will be exploring the various aspects of the Indian caste system and its effects on post Independent India.

Keywords: Class, Caste, Untouchability, Post Independent India, Social discrimination.

ভারতের গ্রামীণ অর্থনীতি ও সমাজের ঘাত-প্রতিঘাতের সম্পর্ক অনুসন্ধান করলে দেখা যায় যে উৎপাদন ব্যবস্থাকে অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল হিন্দুসমাজের জাত ভিত্তিক (caste) সামাজিক স্তরবিন্যাস। সমাজের অস্পৃশ্যদের অবস্থার পরিবর্তন না করে নেহেরু, প্যাটেল, রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রমূখ দেশভাগ করে মাউন্টব্যাটেন প্রদত্ত 'স্বাধীনতা' লাভ করেন। 'স্বাধীন' ভারতের সংবিধানে অস্পৃশ্যতা নিষিদ্ধ হলেও অস্পৃশ্যতা দূর হয় না! দূর হয় না দলিতের দুর্দশা। এই 'গোময়ে তৈরি অট্টালিকা' অর্থাৎ বহু বিজ্ঞাপিত বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র - সময় বিশেষে নিলামে বিক্রি হয়। আবার নির্বাচন যুদ্ধে নিম্নবর্ণ মানুষদের জন্য সংরক্ষিত আসন যে তাদের কাছে 'কাগুজে গণতন্ত্র', শুন্যকুম্ভের আস্ফালনমাত্র; তা প্রতীয়মান হয় দিবালোকেই। আমাদের সমাজ ও রাজনৈতিক জীবনে ধর্মান্ধতা, সাম্প্রদায়িকতা আর জাতপাতের প্রশ্ন এমন ভাবেই জড়িয়ে রয়েছে যে, শুধুমাত্র পবিত্রতা আর অস্পৃশ্যতার ধারণাই নয়, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অন্ধতা যা চরম অর্থনৈতিক বৈষম্য আর প্রভুশ্রেণীর শাসনের ওপর স্থিত, তাকে বিনষ্ট না করে সংরক্ষণ আইন তুলে দেওয়ার বিরোধিতা করাই সঠিক কাজ। আজকের হিন্দুত্ববাদীরা যখন সংরক্ষণ প্রথা বাতিল করার কথা বলেন, তখন তাদের দুরভিসন্ধি বুঝতে দেরি হয়না আমাদের। একদিকে তাঁরা 'দলিত' ভোট পাওয়ার আশায় কোনও দলিতের বাড়িতে অন্নজল গ্রহণ করেন, আবার দলিত বিক্ষোভে নির্বিচারে গুলি চালিয়ে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের ধ্বজা উড়িয়ে দেন। বর্তমান সময় ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের ধ্বজাধারী ভারতের এলিট প্রত্যক্ষ করে সহস্র বছরের উৎপীড়নের বিরুদ্ধে দলিতদের ক্ষোভ আর ক্রোধের বিস্ফোরণ। তাই সমৃদ্ধ রাজনৈতিক তত্ত্ব এবং দিশা সম্পন্ন সংগ্রাম এই জাড্য ভাঙতে পারে। সমাজের শোষিত ও নিপীড়িত জনগণ তাই 'টোটাল রেভলিউশন' এর মধ্যে দিয়ে তাদের 'কাস্ট' বা জাতি নয়, শ্রেণি বা 'class' - সম্পর্কিত দিশা স্পষ্টতর করে নিরন্ন মানুষের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দৈন্য দূর করবে এবং ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের নাগপাশ থেকে সমাজকে মুক্ত করে ভারতবর্ষকে উন্নত বিশ্বের দরবারে উপস্থাপিত করবে।

ভারতবর্ষের ইতিহাস দেখলে দেখা যাবে যে জাতপাতের ধারণা প্রায় ২৫০০ বছর আগে পদার্পণ করেছে ভারত ভূখণ্ডে। এই জাতপাতের ধারণাটি কেবলমাত্র 'হিন্দু' সমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, শিক, খ্রিষ্টান এবং মুসলিম ইত্যাদি সমাজের মধ্যে বিস্তার লাভ ঘটিয়েছিল। ভারতবর্ষের জাতপাতের আলোচনায় বিভিন্ন ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি সন্ধান পাওয়া যায়, এই দৃষ্টিভঙ্গি

গুলিকে আমরা ক্রমোচ্চ শ্রেণি হিসেবে উঁচু এবং নিচু, ছুত-অছুত হিসেবে বিবেচনা করে থাকে। এর মধ্যে যারা নিচুজাতের বা শ্রেণীর তারা সমাজের উঁচু জাতের বা শ্রেণীর দ্বারা প্রতিনিয়ত শোষিত – নিপীড়িত, লাঞ্ছিত - বঞ্চিত হয় এবং তারা অচ্ছুত হিসাবে পরিগণিত হয় সমাজের উচু শ্রেনীর কাছে।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে গড়ে ওঠা জাত-বিরোধী আন্দোলন গুলি তাদের সাংগঠনিক দক্ষতা, স্থায়িত্ব ও প্রভাবের অর্থে সমান ছিল না। কিন্তু বর্ণাশ্রম জাত ব্যবস্থা ও ব্রাহ্মণ্য প্রাধান্যকে অস্বীকার করে নিম্নবর্ণের মানুষকে ভাতৃত্ববোধে উদ্বুদ্ধ করার ক্ষেত্রে তাদের ঐতিহাসিক ভূমিকা অবিসংবাদিত। সামাজিক ও ধর্মীয় নিপীড়ন এবং অক্ষমতার বিরুদ্ধে নিম্নবর্ণের দলিতদের রাজনৈতিক সমাধানের দাবি বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় সোচ্চার হয়ে ওঠে শিক্ষা, কর্মসংস্থান, এমনকি আইন সভায় আসন সংরক্ষণের দাবি মধ্য দিয়ে। ঔপনিবেশিক সরকারি প্রশাসন 'বিভাজন ও শাসন' নীতি অনুযায়ী এই দাবির সমাধানকল্পে 'সংরক্ষণমূলক বিভাজন'- এর নীতি অনুসরণ করতে থাকে ১৯২০-র দশক থেকে। একথা অস্বীকার করা যাবে না যে সরকারি নীতির সাথে ঔপনিবেশিক স্বার্থ জড়িত থাকলেও দলিতদের দাবির প্রতি আপাত অর্থে প্রশাসনিক সহানুভূতি একদিকে সরকারের প্রতি তাঁদের যেমন ঘনিষ্ঠ করে তোলে, অন্যদিকে তেমনি কংগ্রেসের সাথে তাদের দূরত্ব বৃদ্ধি করে। কংগ্রেসের প্রাথমিক পর্বে নেতৃবৃন্দের রক্ষণশীল মনোভাব ও সংবেদনশীল বিষয়সমূহকে এড়িয়ে চলার প্রবণতাও এই দূরত্ব বৃদ্ধির জন্য দায়ী ছিল। উপরন্তু পুনর্জাগরণবাদী আন্দোলনের প্রভাবে হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের অনেকের মধ্যেই অতীতকে গৌরবের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার যে প্রবণতা পরিলক্ষিত হয় তাতে বর্ণাশ্রম প্রথাকে নতুনভাবে বৈধীকরণের প্রচেষ্টাও যুক্ত ছিল, যা দলিতদের কাছে আশঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

স্বাধীনতা আন্দোলনের সমকালীন পরিস্থিতিতে গান্ধীই প্রথম রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব যিনি অস্পৃশ্যতার সমস্যাকে জনসমক্ষে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে আসেন এবং অস্পৃশ্যতা দূরীকরণকে স্বরাজ লাভের অঙ্গ হিসেবে বিচার করেন। মনে রাখা প্রয়োজন যে অপ্রতিযোগিতামূলক শ্রমবিভাজনের দৃষ্টান্তরূপে বর্ণাশ্রম প্রথাকে তিনি সমর্থন করেছেন অন্তত ১৯৪০ সাল পর্যন্ত। সমস্ত বিষয়টা তার কাছে ধরা পড়েছে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে এবং তথাকথিত অস্পৃশ্য জনসমাজের 'হরিজন' নামকরণ সেই অর্থে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা ও অস্পৃশ্যতার সমস্যাকে তার রাজনীতিক ও অর্থনীতিক উৎসমূল থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখার দরুন সমাধানের সূত্র নির্ধারণে গান্ধী সফল হতে পারেননি। তাঁর চিন্তাধারায় হরিজনরা মান্যতা লাভ করলেও ক্ষমতায়নের প্রশ্নে তাঁরা লাভবান হয়নি। ফলে হিন্দু জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠী কিংবা দলিত সম্প্রদায়- উভয়ের কাউকেই গান্ধীর আদর্শ ও কর্মধারা সন্তুষ্ট করতে পারেনি।

অস্পৃশ্যদের অবস্থার পরিবর্তন না করে নেহেরু, প্যাটেল, রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রমূখ দেশে ভাগ করে মাউন্টব্যাটেন প্রদত্ত 'স্বাধীনতা' লাভ করেন। ক্ষমতা হস্তান্তর যখন আসন্ন, তখন অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ের কংগ্রেসী নেতা বাবু জগজীবন রাম বড়লাট ওয়াভেল বলেন, 'ইংরেজদের উচিত আরোও দশ বছর ভারতে তাদের অধিকার কায়েম রাখা; কারণ ইংরেজদের অবর্তমানে বর্ণহিন্দুরা অস্পৃশ্যদের ওপর দমন-পীড়ন আরো বাড়িয়ে দেবে'।

দেশভাগ হয় অর্থাৎ ভারত স্বাধীন হয়, অস্পৃশ্যদের অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয় না। ক্ষমতা হস্তান্তরের পর আম্বেদকর গণপরিষদে তাঁর এক বক্তৃতায় সংবিধানে বিবৃত গণতন্ত্র এবং সামাজিক বৈষম্যের কথা উল্লেখ করে বলেন, 'এই সংবিধান বিদূরিত না হলে(ভারতের) গণতন্ত্র হবে গোময়ে তৈরি এক অট্টালিকার সমতুল্য'।

এই গময়ে তৈরি অট্টালিকাকে আরো পূতিগন্ধময় করে তোলার জন্য রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ ১৯৫০-র দশকে বারাণসীতে সর্ব জনসমক্ষে গঙ্গাজলের দশজন ব্রাহ্মণের পা ধুয়ে দেন। স্বাধীন ভারতের সংবিধানে অস্পৃশ্যতা নিষিদ্ধ হলেও অস্পৃশ্যতা দূর হয় ! দূর হয় না দলিতের দুর্দশা। এই 'গময়ে তৈরি অট্টালিকা' অর্থাৎ বহু বিজ্ঞাপিত বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র- সময় বিশেষে নিলামে বিক্রি হয়। আবার নির্বাচন যুদ্ধে নিম্নবর্ণ মানুষদের জন্য সংরক্ষিত আসন যে তাদের কাছে 'কাগুজে গণতন্ত্র', শূন্যকুম্ভের আস্ফালন মাত্র; তা প্রতীয়মান হয় দিবালোকেই! এই গণতন্ত্র, গণতন্ত্রের রক্ষক ও পৃষ্ঠপোষকদের এবং যে শ্রেণী এই গণতন্ত্রকে লালন করে, তাদের যতই পুলকের কারণ হোক না কেন, অন্ত্যজ কন্যা নিরন্ন বালমনির তা ধরাছোঁয়ার বাইরে। লক্ষ কোটি বালমনির ভোটদানের 'অধিকার' আছে, কিন্তু বাস্তবে তা মরীচিকার মত অলীক তা বোঝা যায় বিশ্বের 'বৃহত্তম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র' নিলামে বিক্রি হওয়ার ঘটনায়।

নিরক্ষর দলিত কৃষিজীবী মহিলা বাল মনি তামিলনাড়ুর প্রত্যন্ত গ্রাম কোডিকুলাম পঞ্চায়েতের সভাপতির পদ দু'লক্ষেরও বেশি টাকায় নিলাম হওয়ার খবর সেই চিরাচরিত প্রশ্নকে ফের উসকে দিল। ভারত নামের এই 'সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে' গণতন্ত্রের অবস্থানটা তাহলে ঠিক কোথায় ?

কুডিকুলমের পঞ্চায়েত সভাপতির আসনটি সংরক্ষিত ছিল দলিত মহিলাদের জন্য। কিন্তু সেই আসনে নির্বাচিত হওয়ার উপায় নেই থেভার'দের(উচ্চবর্ণ সম্প্রদায়) জন্য। কাজেই গ্রামে সাদাসিদে নিরক্ষর দলিত কৃষিজীবী মহিলা বালমনি ভীমনকে জোরজবরদস্তি ভোটে জিতিয়ে সভাপতি করে দেওয়া হলো।

কিন্তু কাজ চলবে কিভাবে ? তাই গ্রামে রীতিমতো ঢাকঢোল পিটিয়ে সভা ডেকে নিলাম হল। তিন তিনটে মাছভর্তি পুকুর আর পঞ্চায়েত সভাপতি, একসঙ্গে নিলাম হল। তবে ঘটনাচক্রে বালমনি নিলামে উঠলেন পরের দিন।

দুই থেভরের মধ্যে জোর টক্করের পরে করুপ্পুস্বামী আইয়াভু থেভার দু'লাখ ষোল হাজার টাকায় কিনে নিলেন পঞ্চায়েত সভাপতিকে। বালমনি এখন থেকে তাঁর এক্তিয়ারে। বকলমের সভাপতি হলেন করুপ্পুস্বামী। এ ব্যাপারে জেলাশাসক যথারীতি অন্ধকারে। আর করুপ্পুস্বামী বিনয় করে বলছেন, বালমনিকে সাহায্য করার লোক দরকার ছিল। গ্রামবাসীরা আমায় বেছে নিলেন। এতে অন্যায়টা কোথায় ?

কিন্তু বালমনির এই দুর্দশার কারণ কি ? তিনি নারী ? তিনি নিরক্ষর ? তিনি দরিদ্র ? নাকি তিনি গণতান্ত্রিক শাসনযন্ত্রের জং ধরা নাটবল্টু ?..... এক সমীক্ষায় বিশ্বের৫৪টি দেশকে 'মেকি গণতন্ত্রের'(flawed democracy) জন্মভূমি বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে ভারত তারই একটা। অবাধ নির্বাচন, নাগরিক স্বাধীনতা, সুপরিচালিত সরকার, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ও রাজনৈতিক সংস্কৃতি - এই পাঁচটি ক্ষেত্রকে মাপকাঠি ধরে বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রকে অনায়াসে 'মেকি' অভিধা দিয়েছেন আন্তর্জাতিক মহল। এই সমীক্ষাটি চালায় 'দ্য ইকনমিস্ট'।

ভারতের গণতন্ত্রের রং যতই চড়া হোক না কেন, এই মহান ভারতে দলিতদের সাংবিধানিক অধিকারকে রসিকতা বলেই মনে হয়। 'গোময় তৈরি অট্টালিকা' ধনীক আর ভূস্বামীদের জন্য অটুট থাকে; যার প্রেরণা জোগায় বর্ণ শাসন সম্পর্কে মহাত্মার চিন্তা-ভাবনা !

ধর্মান্ধ ভারতে মহাত্মা গান্ধী 'জাতির জনক' হিসেবে পরিচিত হলেও তিনি হরিজনদের অন্তর থেকে ঘৃণার চোখেই দেখতেন। গান্ধী তার বিশ্বাসের জন্যই অস্পৃশ্যদের বাড়িতে তৈরি করা খাবার খেতে রাজি হননি। অরুন্ধতী রায় লেখেন, '১৯৪৬ সালে মন্দির মার্গের বাল্মিকী কলোনিতে গান্ধী যখন পরিদর্শনে এসেছিলেন, তখন তিনি সেই গোষ্ঠীর সঙ্গে একসঙ্গে খাবার খেতে অস্বীকার করেন; তিনি বলেন – তোমরা আমাকে ছাগলের দুধ পান করতে দিতে পারো তবে আমি ওই দুধ দাম দিয়ে কিনে নেব। যদি তোমরা আমাকে অন্ন গ্রহণ করার জন্য বেশি পীড়াপীড়ি করো তাহলে এখানে এসো আর আমার জন্য রান্না করো'। একজন অস্পৃশ্য মহাত্মাকে কিছু বাদাম দেন, কিন্তু মহাত্মা ওই বাদাম নিজে না খেয়ে তাঁর ছাগলকে খাইয়ে দেন এবং বলেন, 'পরে ছাগলের দুধ থেকে ওগুলো খেয়ে নেব'। অস্পৃশ্যরা তাঁর ভন্ডামি বুঝতে পারেন।

গান্ধীজী গোধরাতে এক সামাজিক সম্মেলনে উচ্চবর্ণের মানুষদের বললেন অস্পৃশ্যদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপনে ও পরিচালনে সাহায্য করতে। বললেন অস্পৃশ্যতা ভারতের কপালে একটি কলঙ্কচিহ্ন। গুজরাটি স্ত্রী কে প্রদত্ত এক বাণীতে বললেন, আধুনিক শিক্ষা নারীদের যথার্থ ভূমিকা পালনের জন্য প্রস্তুত করতে ব্যর্থ। তিনি আরো বললেন, নারীরা নিজেদের কর্তব্য ভুলে মন্দিরে কালক্ষেপন করবেন না। তাঁরা 'পবিত্র বাবা'দের জন্য ধর্না দেবেন না। পবিত্র বাবারা তাদের সেবার অপেক্ষায় বসে নেই। নারীরা তাদের সর্বপ্রকারে সেবা করবে না।

কিন্তু পরবর্তীকালে আমরা দেখব গান্ধীজী 'পবিত্র বাবা' হয়েছেন তখন তার সেবায় মহিলারা কালক্ষেপণ করছেন, সাহায্য করছেন সর্বতোভাবে। এমনকি কেউ কেউ তার সঙ্গে শয়নও করছেন।

সমাজের এলিট শ্রেণী অস্পৃশ্যদের রাজনীতির বিরুদ্ধে কমিউনিস্টদের তত্ত্ব ও তথ্য সমৃদ্ধ হয়ে লড়াই করবে। কংগ্রেস নেতাদের কাছে হরিজন প্রীতি ছিল হাস্যকর এবং ক্ষতিকর। সিপিআই (এম) তার অন্তিম শয্যা গ্রহণ করছে, সংরক্ষিত আসনে ভোট প্রার্থী দেওয়া ছাড়া এরা কোনও কাজ করে না। সাম্প্রদায়িকতা এবং জাতপাত বিরোধী কোনো কার্যকর বক্তব্য সিপিআই (এম)দলের নেই। আম্বেদকর প্রশ্ন করেন কাদের স্বাধীনতার জন্য কংগ্রেস লড়ছে ? স্পষ্টতই গান্ধীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস তার

আন্দোলন চালায় বৃহৎ পুঁজিপতি, সামন্তপ্রভু আর বর্ণহিন্দুদের স্বাধীনতার জন্য। এখানে শোষিত এবং অস্পৃশ্যরা কোন স্বাধীনতা পায়নি। আম্বেদকরের জন্মদিন 'ছুটির দিন' ঘোষণা করলেও অস্পৃশ্যরা অবমানবই আছেন। ডোমদের জীবনের কোন পরিবর্তনই হয়নি 'স্বাধীন' সেক্যুলার ভারতে।

গান্ধী এবং আম্বেদকর এর দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে গান্ধীজী হিন্দু ধর্ম কে বাঁচানোর চেষ্টা করলেও আম্বেদকর হিন্দু ধর্মকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে গেছেন। তাই আম্বেদকর হিন্দু ধর্ম পরিত্যাগ করে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন। ভারতের গণতন্ত্র যে সামাজিক ও রাজনৈতিক সাম্যের দুর্গ না হয়ে গোময়ে নির্মিত অট্টালিকা হয়েই রয়েছে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। 'সেকুলার' ভারতে মন্দির 'অপবিত্র' করার অছিলায় 'হরিজন' নিধন নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। কিন্তু রাষ্ট্র, সরকার বা রাজনীতিকরা অস্পৃশ্যতার সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার চেষ্টা করেন না। তারা অস্পৃশ্যদের এই সংস্কৃতি কে কেন্দ্র করে নিজেদের ভোট রাজনীতির ফায়দা ওঠানোর চেষ্টা করেন। তাই বর্তমান নির্বাচন প্রথা জাতি প্রথা কে সঞ্জীবিত করে। শূদ্র হত্যাকারী রামচন্দ্রের ভক্ত গান্ধী বলেন, 'অস্পৃশ্যতা বিলুপ্তি হবেই, কারণ হিন্দুধর্ম বাঁচবে, আর যদি অস্পৃশ্যতা দূর না হয়, তাহলে হিন্দু ধর্ম অবলুপ্ত হবে'। একুশ শতকের ভারতের সাংবিধানিক বিধি নিষেধ সত্বেও সমাজ জীবনে আজও অস্পৃশ্যতার প্রতাপ খর্ব করা যায়নি। হিন্দু ধর্মের অচলায়তনে হুনুই গেছে। জাতপাতের রাজনীতি করে একের পর এক সরকার এসেছে এবং গেছে। আর তাই ২০০৪-০৫ সালের সেক্যুলার জোট শাসিত ভারতের এক মারকামারা মানবতার চরম লাঞ্ছনা ঘটে অসহায় এক অস্পৃশ্য নারী নির্মলা দেবীর। এই ধরনের ঘটনা এই প্রথম নয় এবং অতি অবশ্যই শেষ নয়। নগ্ন করে ঘোরানো হয়েছে তাকে, গ্রামের উচ্চবর্ণ ভূস্বামীদের কথামতো তাদের বাড়িতে কাজ করতে না চাইবার অপরাধে। গ্রামের উচ্চবর্ণের লোকেরা এই অস্পৃশ্য মহিলার ঔদ্ধত্যের যে শাস্তি দিয়েছেন তা মনে করিয়ে দেয় মুন্সি প্রেমচাঁদ এর গল্প কে।

গ্রামের উচ্চবর্ণের লোকেরা সারারাত ধরে নির্মলা দেবীকে বেঁধে রেখে পিটিয়েছেন। সকাল হলেই সর্বসমক্ষে তাকে 'শিক্ষা' দেওয়ার জন্য তার মাথার চুল কামিয়ে দেওয়া হয়েছে। এরপর নগ্ন করে তাকে ঘোরানো হয়েছে পুরো এলাকা। নির্মলা দেবীর মত কোন নিচু জাতের মানুষ যাতে আর বেয়াদবি করতে সাহস না করে তার জন্য হুমকিও দিয়েছেন বর্ণহিন্দুরা …….. উচ্চবর্ণের লোকের এই আইনকে নির্মলা এর মত অনেকেই মুখ বুজে সব সহ্য করতে বাধ্য হয়েছেন।

আবার বামফ্রন্টের শাসনকালে পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রদায়িক জাতপাতের মতাদর্শ কমেছে বলে তারা দাবি করলেও বাস্তবে তা ঘটেনি। হুগলির পুড়শুড়া অঞ্চলের এক গ্রামে এক নারী মন্দিরে ঢুকে দেবীর ঘট স্পর্শ করে তার সিঁদুর কপালে লাগিয়েছিলেন। তাঁর এই আচরণ কি অপরাধ বলে গণ্য করা হয়, কারণ সেই নারী জাতে ছিলেন হাড়ি। এই অপরাধের জন্য দেবীর আসন শুদ্ধিকরণের, পুনরায় দেবীর ঘট পুনঃস্থাপন ও পূজা করাবার জন্য সমস্ত খরচ বহন করতে হয় ওই হাড়ি পরিবারকে। এই ধরনের জাতপাতের রাজনীতি একদিকে যেমন বর্ণহিন্দুদের ছোট করে অন্যদিকে জনসমষ্টি ও জাতিকে হতবাক করে তোলে।

সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক ঘটনা আবারও উস্কে দিল ভারতের জাতপাতের বিষয়কে। হায়দ্রাবাদের এক যুবতী এক দলিত কে বিবাহ করায় বাবার হাতে যুবতীর প্রাণনাশের ঘটনা ঘটে। যুবতীর (মাধবী) পিতা মনোহর তাদের বলেন যে, তারা যেন তার সঙ্গে দেখা করেন। এই অবস্থায় মাধবী ও তার স্বামী সন্দীপ মাধবীর পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসলে মাধবীর পিতা মনোহর তাদের ওপর ধারালো অস্ত্র নিয়ে চড়াও হয়। সন্দীপ গুরুতর আহত হলে মাধবীর ওপর তার পিতা অস্ত্র চালাতে থাকে – "নান্না (বাবা) আমাকে মেরো না, আমাকে মেরো না", বলে রাস্তায় পড়ে আর্তনাদ করতে থাকে মাধবী। এরপর পুলিশের জেরায় মনোহর বলেছেন, "বিয়ে করার পরেই জানতে পারি দু'জনের সম্পর্কের কথা। আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না এই বিয়ে। আমি কাল খুনি করে ফেললাম মেয়েকে"।

আমাদের সমাজ ও রাজনৈতিক জীবনে ধর্মান্ধতা, সাম্প্রদায়িকতা আর জাতপাতের প্রশ্ন এমনভাবে জড়িয়ে রয়েছে যে, শুধুমাত্র পবিত্রতা আর অস্পৃশ্যতার ধারণাই নয়, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অন্ধতা যা চরম অর্থনৈতিক বৈষম্য আর প্রভু শ্রেণীর শাসনের ওপর স্থিত, তাকে বিনষ্ট না করে সংরক্ষণ আইন তুলে দেওয়ার বিরোধিতা করায় সঠিক কাজ। তবে এও ঠিক সংরক্ষণ প্রথা বজায় রাখার অর্থ, বর্ণপ্রথা কে বাঁচিয়ে রাখা। বর্তমানে 'দলিত আইন' শিথিল করার অর্থ, দুষ্কৃতী ও রাজনৈতিক গুন্ডাদের একাধিপত্য বজায় রাখা। দলিত নারীর ওপর অত্যাচার আর নির্বিচারে দলিত হত্যা এসব চলতেই থাকবে ; তা হয়তো আরো বাড়বে।

এক সাম্প্রতিক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, আদিবাসী ও দলিতদের অবস্থান নয়া উদারনীতি'র অনেক নিচে নেমে গেছে। আয়, শিক্ষা এবং চাকুরী ইত্যাদি ক্ষেত্রে দলিত ও আদিবাসীদের অবস্থা শোচনীয় হয়েছে। আর বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই সময়ে উচ্চবর্ণ মানুষের প্রভূত উন্নতি হয়েছে। দলিত মহিলাদের সম্মানহানি ও নির্যাতন প্রভূত মাত্রায় বেড়েছে। বর্তমান কেন্দ্রীয় ও বিভিন্ন রাজ্য সরকারগুলি দলিতদের গভীরতম অন্ধকারে ঠেলে দিয়েছে। ব্রাহ্মণ্য তন্ত্র তথা 'কর্তৃত্বপূর্ণ সংস্কৃতি' ভারতীয় জনতা পার্টির শাসনামলে অধিক জনপ্রিয় হয়েছে। ভারত বনধ প্রাক্তন অস্পৃশ্যদের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ প্রচার করে। এই হিন্দুত্ব ধ্বংস হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। দারিদ্র কোন কাস্ট বা কোন ধর্ম বিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল নয়। প্রতিটি কাস্ট বা জাতির মধ্যে দরিদ্র বর্তমান। সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক রিপোর্টে দেখা যায় গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র পরিবার পিছু মাসিক ব্যয় ৪১০ টাকার মধ্যে ৪০ শতাংশ হলো তপশিলি জাতি,৪৯ শতাংশ হলো তপশিলি উপজাতি,৩০ শতাংশ হলো ওবিসি এবং অন্যান্য হলো ২০ শতাংশ। এই অন্যান্যের মধ্যে মুসলমান পরিবারগুলো আছে। বিপুল বৈষম্য শাসিত দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নিপিরণের তাত্ত্বিক যুক্তির মূলচ্ছেদ করাও দরকার। প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন এক বিপ্লব; বর্তমান নীতিনির্ধারকরা এই কাজ করবেন না, তাই প্রয়োজন এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গির।

সংবিধানের ১৭ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে যে অস্পৃশ্যতার বিলোপ সাধন করতে হবে। কিন্তু হিন্দুত্বের ক্ষেত্রে কোন আঁচড় পড়ে না। গান্ধীর মতে, 'মেথরের সন্তান নিজেকে ছোট মনে না করেও মেথরই থাকুক', আর ঠিক একইভাবে 'ব্রাহ্মণ তার মন থেকে অস্পৃশ্যদের প্রতি ঘৃণা ত্যাগ করুক ...' এ শুধু প্রকাণ্ড ধাপ্পা হয়েই আছে ; বাস্তবে প্রতিফলিত হয়নি। বেদ, গীতা, উপনিষদ আর মনুসংহিতার বিধান বর্ণহিন্দুরা বিসর্জন দেননি। আজকের হিন্দুত্ববাদীরা যখন সংরক্ষণ প্রথা বাতিল করার কথা বলেন তখন তাদের দুরভিসন্ধি বুঝতে দেরি হয়না আমাদের। একদিকে তারা 'দলিত ভোট' পাওয়ার আশায় কোন দলিতের বাড়িতে অন্নজল গ্রহণ করেন, আবার দলিত বিক্ষোভে নির্বিচারে গুলি চালিয়ে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের ধ্বজা উড়িয়ে দেন। আজ নরেন্দ্র মোদির কুম্ভ যাত্রা অথবা রাহুল গান্ধীর 'হরিজন' প্রীতি দলিতের আর্থসামাজিক মুক্তি আনতে ব্যর্থ হতে বাধ্য। কারন এরা সকলেই ধনিক শ্রেণীর প্রতিনিধি। এরা শ্রমিক,কৃষক, শ্রমজীবী মানুষ, নিরন্ন মুসলমান অথবা অন্ত্যজের প্রতিনিধি করেন না। আজ প্রায় সকলেই হিন্দুত্বের আস্ফালনে বিচলিত ; কিন্তু অদূর অতিতে দুর্গা, সুতা, ভারতমাতা রূপে বন্দিতা, রুদ্রাক্ষের কণ্ঠহার ভূষিতা শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী 'বিশ্ব হিন্দু পরিষদে'র উত্থানের স্বাগত জানান। ভারতের রাজনৈতিক হিন্দু নেতারা সাধুসন্তের আশীর্বাদ ছাড়া এক পা -ও এগোতে পারেন না যদিও এই সাধু-সন্তরা অনেক অপকর্ম করেন এবং এরা সকলেই জাতিভেদ প্রথা তথা ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের পক্ষে। প্রকৃতপক্ষে হিন্দুত্বের মধ্যেই 'বর্ণভেদ' এর মূল প্রোথিত রয়েছে। 'মন্ডল কমিশন' প্রযুক্ত হওয়ার পর অনেকগুলো বছর কেটে গেছে, কিন্তু প্রাক্তন অস্পৃশ্যদের অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন হয়নি, ভারতের পবিত্র সংবিধানে প্রদত্ত 'রক্ষাকবচ' দলিতদের অবস্থার পরিবর্তন করতে পারেনি। অনেক ক্ষেত্রেই এই রক্ষাকবচ গুলিকে অলীক বলেই মনে হয়।

আজ হিন্দুত্ববাদীরা শ্রেণী শোষণ আর সাম্রাজ্যবাদের লুণ্ঠন আড়াল করবার জন্য এক 'মনোলিথিক হোমোজিনিয়াস' হিন্দু 'নেশন' এর কথা প্রচার করেন। এ সূত্রপাত হয় অনেক আগেই। অধ্যাপক রজনী ১৯৮৯ সালে এক লেখাই বলেন, 'আমরা এক 'মাল্টিকালচারাল', 'মাল্টিন্যাশনাল' দেশ'। এই দেশকে বেঁধে রেখেছে আমলাতন্ত্রের লৌহকঠিন 'ফ্রেম' আর এক জাতীয়তাবাদ ; কর্তৃত্বপরায়ণ, জঙ্গি এবং মৌলবাদী মতাদর্শ। এই মৌলবাদের উৎস সনাতন অবয়বহীন 'হিন্দুধর্ম' বা 'সনাতন ধর্ম'।

২০১৮ সালের এপ্রিলে দলিতদের উপর হিংস্র আক্রমণ সংগঠিত করে বিজেপি সরকার। দলিতের আত্মমর্যাদার ঘোষণা পবিত্র ভারতভূমিতে ছড়িয়ে পড়ে। রোহিত ভামূলার আত্মহত্যা, আম্বেদকর এর মূর্তির অসম্মান, সংরক্ষণ ব্যবস্থা তুলে দেওয়ার উদ্যোগ এবং সংবিধান রিভিউ করার পরিকল্পনা, গোরক্ষা আন্দোলন – এসবই ২ এপ্রিল,২০১৮ 'ভারত বনধ' এর কারণ। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের ধ্বজাধারী ভারতের এলিট প্রত্যক্ষ করে সশস্ত্র বছরের উৎপীড়নের বিরুদ্ধে ক্ষোভ আর ক্রোধের বিস্ফোরণ। তেমন কোনো সাংগঠনিক নেতৃত্ব না থাকলেও পঞ্চম বর্ণ আজ মাথা তুলে দাঁড়ালো। বিস্ময় আরজিনার কারণে উচ্চবর্ণের ডাকা ভারত বনধ তেমন কোন সাড়া ফেলতে ব্যর্থ হয়। দলিতের এই স্বতস্ফূর্ত প্রতিবাদে হিন্দুত্ববাদীদের টনক নড়ে। প্রাক্তন উপরাষ্ট্রপতি এবং আম্বেদকর এর ভজনা, - এই ধরনের উৎকোচে মোদি সরকার বা হিন্দুত্ববাদীদের বিশেষ লাভ হবে বলে মনে হয়। ২০১৬ সালে দুলিতদের বিরুদ্ধে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে ৪০,৮০১ টি অপরাধ সংগঠিত হয়েছে।

দলিত সমাজ সংরক্ষণ বহাল রাখার পক্ষে, কিন্তু স্বল্পকাল পূর্বে 'দলিত প্যান্থার' 'টোটাল রেভলিউশন' এর আহ্বান জানান। বর্তমান অবস্থায় আক্রমণাত্মক হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাকে প্রশ্রয় দিয়ে তিন তালাক প্রথা নিষিদ্ধ করা যেমন ক্ষতিকারক, এর ফলে পারস্পরিক বিদ্বেষ বৃদ্ধি পাবে, তেমনি বর্তমান অর্থনৈতিক শোষণ বা শ্রেণী শোষণকে প্রশ্রয় দিয়ে সংরক্ষণ আইন বাতিল করা এক অপরাধ। এই কারণেই সমৃদ্ধ রাজনৈতিক তত্ত্ব এবং দিশা সম্পন্ন সংগ্রাম এই জাড্য ভাঙতে পারে। কমিউনিস্ট বিপ্লবী ও দলিত কাস্টগুলির নৈকট্য বাড়িয়ে, ধর্মহীন জগৎবীক্ষায় প্রাণিত হয়ে সমাজব্যবস্থা পরিবর্তনের পথে এগোতে হবে। 'কাস্ট' বা জাতি নয়, শ্রেণী বা 'class' – এই সম্পর্কিত দৃশ্য স্পষ্টতর করে নিরন্ন মানুষের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দৈন দূর করতে হবে। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের নাগপাশ থেকে সমাজকে মুক্ত করতে হবে।

আম্বেদকর এর মৃত্যুর পর 'দলিত প্যান্থার' সংঘটিত হয়। পরবর্তীকালে এই সংগঠনটি প্রধান দু'টি ভাগে বিভক্ত হয়ে গেলেও তারা 'ক্লাস – কার্স্ট – স্ট্রাগল'বা শ্রেণি -জাতি -সংগ্রাম গড়ে তোলা নিয়ে মতানৈক্যে পৌঁছায়। এরা সশস্ত্র সংগ্রামের কথা চিন্তা করে। এরা কমিউনিসট বিপ্লবীদের সম্পর্কে আগ্রহী এবং কমিউনিস্ট বিপ্লবীরাও এদের সম্পর্কে আগ্রহী। জাতিভেদ প্রথা উৎখাত করার দৃঢ় সংকল্প এরা অবিচল ; এরা মার্কসের তত্ত্বে আস্থা স্থাপন করে। কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের দু'টি সংগঠন এদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে। বর্তমানে কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের মতোই 'দলিত প্যান্থার'ও বহুধাবিভক্ত। ভারতের সর্বাঙ্গীন বিপ্লব অর্থাৎ 'টোটাল রিভলিউশন' ঘটানোর জন্য সমস্ত বিভেদ নিরসন করে তীব্রতর শ্রেণিসংগ্রাম গড়ে তোলা প্রয়োজন। সঙ্গে থাকুক ধর্মহীন জগৎবীক্ষা। ভারতে এক মাহেন্দ্রক্ষণ সমাসন্ন।

পরিশেষে বলা যায়, স্বাধীন ভারতের ইতিহাসের এই জাতপাতের রাজনীতি দূরীভূত হোক, হোক মানুষের মনের অপসংস্কৃতি ও ভ্রান্ত ধারণার অন্ধকার। জাগরিত হোক মানবমনের বিগরিত উজ্জ্বল আলো, যে আলো প্লাবন আনুক হতদরিদ্র, শোষিত শ্রেণীর জীবনধারায়। সমাজ, রাষ্ট্র এবং সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হোক জনকল্যাণের দিকে – প্রসারিত হোক নব আলোক জাতি'র মানব বন্ধনের দিশা হিসাবে। একদিকে পাশ্চাত্যের ঈশ্বরের শেষ প্রহর ঘোষণা করবার জন্য অনেক মানুষ যেমন প্রাণ দিয়েছে, তেমনি ধর্মান্ধ ভারতে ঈশ্বরের শেষ প্রহর ঘোষণা করবার জন্যও মানুষের প্রাণ ব্যয় হবে। আর এই প্রাণ ব্যয় ও রক্ত স্থানের মধ্যে দিয়ে ভারত হয়ে উঠুক ধর্মহীন। ঈশ্বরের শেষপ্রহরের ঘোষণা ত্বরান্বিত করবার জন্য শক্ত হাতে এগিয়ে আসতে হবে বাহুকে তীব্র থেকে তীব্রতর কাঠিন্য করতে হবে জাতির কল্যাণে।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী:

- মুখোপাধ্যায় শুভঙ্কর, ' অস্পৃশ্যদের ইতিকথা', অনিক, বিশেষ সংখ্যা,২০০৫
- চট্টোপাধ্যায় রুদ্রপ্রতাপ,'একটি অকপট জীবনী মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী'(২০০৪), অমৃত শরণ প্রকাশন, বিদ্যাসাগর রোড, কলকাতা -৭০০১২৬,পৃ.৯৭-১০৬
- মুখোপাধ্যায় শুভঙ্কর, 'দ্বিজাতি তত্ত্বের ইতিবৃত্ত',(২০১৪) কলকাতা, উবুদশ,পৃ.১৩০
- মুখোপাধ্যায় অশোক কুমার, 'ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তা পরিচয়'(২০১৩), পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ,পৃ.২৬৫-৩০৬
- Chandra Bipan ,Mukherjee Mridula,Mukherjee Aditya, 'Indian Since Independence'(2008),Moida,New Delhi,peg.631-640
- Mukherjee Anuradha, 'Constitutional Safeguards for the dalit :The Myth and Realit'(2002),New Delhi,peg.33-41
- আনন্দবাজার পত্রিকা,০৫.০৫.২০০৫
- চক্রবর্তী বিকাশ, 'ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম'(২০০৭), পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা,পৃ.১২০-১৪৯
- পূর্বোক্ত,১৫০-১৯০
- গান্ধী মোহনদাস করমচাঁদ, 'গান্ধী রচনা সম্ভার'(১৯৭০), ষষ্ঠ খন্ড, গান্ধী শতবার্ষিকী সম্মিলনী ,৩- মজুমদার স্ট্রিট কলকাতা ৯
- মুখোপাধ্যায় শুভঙ্কর, 'শ্রেণী জাতি অস্পৃশ্যতা'(২০১৯), এসপি কমিউনিকেশন ৩১ বি রাজা দিনেন্দ্র স্ট্রিট কলকাতা,পৃ.৯৮-১১৫
- আনন্দবাজারপত্রিকা,৩০.০৩.২০০৫
- 'কাজে নারাজ, অ্যাসিড দিলে হত্যা দলিত কে', আনন্দবাজার পত্রিকা,২৮.০৭.২০০৮

- Roy Arundhati,The Doctor and the Saint.Introduction to B R Ambedkar.Annihilation of caste.Navayan Pvt.Ltd.
- Dalit Panther Manifesto;quoted in ibid.p.337
- আনন্দবাজার পত্রিকা,২০.০৯.২০১৮
- রাহা সুব্রত, 'অস্পৃশ্যতা রাজনীতি', 'মর্ডান কলাম', ভাদ্র -১৩৬৪,পৃ.১১৩-১১৮
- রাহা সুব্রত, 'অস্পৃশ্যতা রাজনীতি: সমকালীন সংবাদপত্রের দর্পণ', 'মর্ডান কলাম', ভদ্র -১৩৬৪ ,পৃ.১১৯-১২৮